৪৭তম লিখিত বিষয়ভিত্তিক পরীক্ষা

বাংলা : ৩ + গণিত : ২

মোট সময় : ২ ঘন্টা **(নমুনা উত্তরপত্র)**

[দ্রষ্টব্য: প্রত্যেক প্রশ্নের মান প্রশ্নের শেষ প্রান্তে দেখানো হয়েছে]

BCS CONFIDENCE বেলাল আহমেদ রাজু কনফিডেন্স

বাংলা-৩ (৭৫)

[খাতায় উত্তর লেখার সময় প্রার্থীদের অবশ্যই প্রশ্নের ক্রমানুসারে উত্তর লিখতে হবে; অন্যথায় উত্তর মূল্যায়নযোগ্য হবে না।]

নম্বর

১. **ভাব সম্প্রসারণ লিখুন :** (যে কোন একটি) ২০

** নির্দেশনা :

i. প্রতিটি ভুল বানানের জন্য ০.২৫ নম্বর কাটা যাবে।

ii. প্রশ্নের সাথে প্রাসঙ্গিক উত্তর লিখলে সর্বোচ্চ ১৪ - ১৫ দিতে পারেন, সর্বনিম্ন ৭ - ৮, এভারেজ নম্বর ১০ - ১১।

iii. প্রতিটি প্রশ্নে ২/৩টি মন্তব্য লিখে দিবেন।

রাত্রে যদি সূর্যশোকে ঝরে অশ্রুধারা,
সূর্য নাহি ফেরে, শুধু ব্যর্থ হয় তারা।

নমুনা উত্তর:

মূলভাব: সূর্য অস্ত গেলে যারা রাতের বেলায় সূর্যের জন্য হাহাকার করে, তাদের রাত হয় দীর্ঘস্থায়ী। অনুরূপভাবে যারা অতীতের দুঃখের স্মৃতিচারণায় কিংবা সুখের প্রত্যাশায় কাতর হয়, সুখ তাদের কাছ থেকে অনেক দূরে সরে যায়।

সম্প্রসারিত ভাব: মানব জীবন অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ—এই ত্রিমাত্রিক কালচক্রে আবর্তিত। এই কালপরিক্রমায় ভবিষ্যৎ নিয়ে মানুষের অধীরতা থাকা স্বাভাবিক। কিন্তু কিছু মানুষ বিগত দিনের সুখ বা সাফল্যকে ভুলতে না পেরে অথবা দুঃখ-কষ্টের স্মৃতিতে ডুবে থেকে বর্তমানকে অবহেলা করে। তারা অতীতের স্মৃতিকে বুকে আঁকড়ে থাকতে চান এবং বর্তমানের চেয়ে অতীতকেই অধিকতর সুখময় বলে মনে করেন। তাদের বুঝতে হবে, শত চেষ্টা করেও অতীতকে কখনোই ফিরিয়ে আনা যায় না। বর্তমানই মানুষের জীবনের সবচেয়ে ফলপ্রসূ বাস্তব। আমাদের অতীতের জন্য আকাঙ্ক্ষা না করে, বরং বর্তমানকে হাতের মুঠোয় নিয়ে তার মধ্যেই জীবনের সার্থকতা খোঁজার চেষ্টা করাই শ্রেয়। অতীত থেকে অভিজ্ঞতা লাভ করে যদি বর্তমান রচনা করা যায়, তবেই আমাদের ভবিষ্যৎ সুন্দর হবে। অসময়ে কোনো কিছুর প্রত্যাশা মানব জীবনে কেবল হতাশা সৃষ্টি করে। পৃথিবীতে যেমন নিরবচ্ছিন্ন সুখ বলে কিছু নেই, তেমনি দুঃখও কারো জীবনে স্থায়ী আসন পেতে বসে না। মানব জীবনে দুঃখের পর স্বাভাবিক নিয়মেই সুখ আসে। তাই দুঃখ- কষ্টের অধিক কাতর হওয়া উচিত নয়। আবার দুঃখ বা বিপদের কালীন সুখের জন্য অতি মাত্রায় লালায়িত হওয়া ঠিক নয়। তাহলে সুখ জীবন থেকে অনেক দূরে সরে যাবে, আর দুঃখ জীবনে স্থায়ী আসন পেতে বসবে। ইতিহাসবিদরা বলেন, "History repeats itself" অর্থাৎ ইতিহাস চক্রাকারে ঘোরে। আর ইতিহাস কিংবা চলমান সময়ের আবর্তনে ঘরে পৃথিবীতে একদিকে অনেক সভ্যতা বিলীন হয়ে গেছে, অন্যদিকে উত্থান ঘটেছে নতুন নতুন সভ্যতার। আবার অনেক রাজা- বাদশা বা ধনী ব্যক্তি পতিত হয়েছেন দুঃখ- কষ্টের মধ্যে। অন্যদিকে অনেক দুঃখী ব্যক্তির জীবনে এসেছে সুখের ছোঁয়া। তাই রাতের বেলায় সূর্যের জন্য শোকগ্রস্ত না হয়ে রাতকে যেমন স্বাভাবিকভাবে বরণ করে নেওয়া উচিত, তেমনি দুঃখের সময় বিচলিত না হয়ে দুঃখকে স্বাভাবিক নিয়মে অতিক্রান্ত হওয়ার সুযোগ দেওয়া উচিত।

মন্তব্য: প্রকৃতির অমোঘ নিয়ম অনুসারে পৃথিবীতে রাত-দিন পালাক্রমে আসে। কালপরিক্রমায় দিনের পরে রাত আসে, আর রাতের পরে দিন আসে– এটাই সৃষ্টির স্বাভাবিক নিয়ম। দিন- রাতের মতো সুখ- দুঃখও মানুষের ঘনিষ্ঠ সঙ্গী। তাই দুঃখের সময় সুখের জন্য লালায়িত না হয়ে সুখের আগমনের ক্ষেত্র প্রস্তুত করতে হবে। আর তা না করে দুঃখের সময় তাৎক্ষণিক সুখের জন্য লালায়িত হলে সুখের আগমন অনেক বিলম্বিত হবে।

অথবা,
অসির চেয়ে মসী বড়।

মূলভাব: পৃথিবীতে মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে শারীরিক শক্তি বা বলপ্রয়োগের দ্বারা জয়ী হওয়ার জন্য নয়, বরং সুস্থ ও স্বাভাবিক পরিবেশ বজায় রেখে জ্ঞান, বুদ্ধি ও বিবেক ব্যবহার করে পৃথিবীকে জয় করার জন্য।

সম্প্রসারিত ভাব: অসি হলো তরবারির শক্তি—দৈহিক বল ও ধ্বংসাত্মক ক্ষমতার প্রতীক। পক্ষান্তরে, মসী হলো কলমের কালি—জ্ঞান, বুদ্ধি, ও চেতনার প্রতীক। তরবারির শক্তি দৃশ্যত বিশাল ও ভয়ংকর। এর আঘাতের মাধ্যমে শত্রুকে দমন করা যায়, রাজ্য জয় করা যায় এবং মুহূর্তের মধ্যে বহু প্রাণ নাশ করা যায়। কিন্তু অসির এই ক্ষমতা ক্ষণস্থায়ী এবং ধ্বংসাত্মক। ইতিহাসের দিকে তাকালে দেখা যায়, চেঙ্গিস খান, নাদির শাহ, হিটলারের মতো অসংখ্য শাসক তরবারির জোরে বিশাল প্রভাব বিস্তার করেছিলেন। আপাতদৃষ্টিতে তাঁরা দুর্জয় বীরের আখ্যা পেলেও, তাঁদের কর্মকাণ্ড ছিল নৃশংস ও কলঙ্কিত। তাঁদের ক্ষমতা ছিল সামরিক শক্তির ওপর নির্ভরশীল, যা বল বা ধার কমে গেলে বা ক্ষমতাচ্যুত হলে চিরতরে শেষ হয়ে যায়। ইতিহাসের পাতায় তাঁদের স্থান হয়েছে নিন্দিত ও ঘৃণিতরূপে, এবং কালের বিবর্তনে তাঁরা বিস্মৃতির অতল গভীরে হারিয়ে গেছেন। অন্যদিকে, লেখনীর শক্তি হলো জ্ঞান, দর্শন, সাহিত্য, বিজ্ঞান, চিকিৎসাশাস্ত্র ও রাজনীতির মতো বিষয়গুলোর মাধ্যমে মানবকল্যাণে নিয়োজিত চিরন্তন শক্তি। মসী-শক্তির অধিকারী মনস্বীরা তাঁদের জ্ঞান ও চিন্তাধারা লেখনীর মাধ্যমে লিপিবদ্ধ করে গেছেন। তাঁদের এই অবদান মানব-সভ্যতার ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লেখা রয়েছে। তাঁরা কোনো রক্তপাত বা ধ্বংসযজ্ঞ ছাড়াই মানবতাকে সঠিক পথের দিশা দিয়েছেন। জ্ঞান কখনো ফুরিয়ে যায় না, বরং এক প্রজন্ম থেকে আরেক প্রজন্মে সঞ্চারিত হয়ে উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে থাকে। লেখনীর মাধ্যমে তাঁরা যে সভ্যতা, সংস্কৃতি, ও সৃজনশীলতা সৃষ্টি করে গেছেন, অসি বা তরবারি কখনোই তা ধ্বংস করতে পারে না। মসী আত্মজাগরণকে বিস্তৃত করে বিশাল মানব সমাজে সভ্যতা ও ন্যায়ের বার্তা ছড়িয়ে

দেয়। জ্ঞানই মানুষকে ধ্বংসের পথ থেকে রক্ষা করে। "Pen is mightier than the sword"—এই প্রবাদটি তাই বারবার প্রমাণিত হয়েছে পৃথিবীর বুকে।

মন্তব্য: অসির চেয়ে মসী কেবল শক্তিশালীই নয়, এটি মানবকল্যাণে উৎসর্গীকৃত। জাগতিক জীবনে যা কিছু কেবল শক্তি বা বল দিয়ে জয় করা যায় না, তা জ্ঞান ও বুদ্ধি দিয়ে খুব সহজেই অর্জন করা সম্ভব। শারীরিক শক্তির ওপর নির্ভরতা দুর্বলতা সৃষ্টি করে, কিন্তু জ্ঞানের ওপর নির্ভরতা মানুষকে আত্মমর্যাদাশীল ও শক্তিশালী করে তোলে। মানবতা ও প্রগতিকে নিশ্চিত করতে তাই তরবারির ধ্বংসাত্মক ক্ষমতার চেয়ে কলমের সৃষ্টিশীল ও শুভশক্তির চর্চাই অধিকতর কাম্য।

২. **বাংলায় অনুবাদ করুন :** ১৫

** নির্দেশনা :

i. প্রতিটি ভুল বানানের জন্য ০.২৫ নম্বর কাটা যাবে।

ii. প্রশ্নের সাথে প্রাসঙ্গিক (ভাবানুবাদ) লিখলে সর্বোচ্চ ১১ - ১২ দিতে পারেন, সর্বনিম্ন ৭ - ৮, এভারেজ নম্বর ৯ - ১০।

iii. ভুল অনুবাদ লিখলে শুদ্ধ করে দিবেন প্লিজ।

Bangladesh is indisputably the crucible of the contemporary microcredit movement, where the provision of non-collateralized loans to the financially disenfranchised has burgeoned into a ubiquitous financial apparatus designed to unlock the latent entrepreneurial proclivities of the poor, thereby allowing them to transcend penury. The empirical data unequivocally underscores microcredit's role as an instrumental force in poverty amelioration, significantly augmenting household incomes and bolstering female economic agency, particularly as women constitute the vast majority of borrowers. However, the sector is not devoid of its vexing challenges; critics often articulate apprehension regarding the sustainability of high interest rates, which can precipitate a detrimental cycle of over-indebtedness for a segment of the clientele, and there remains a persistent dichotomy in its ability to accommodate the financial needs of the 'hardcore' poor. Consequently, while microcredit remains a pivotal mechanism for inclusive socio-economic growth, its future efficacy is contingent upon rigorous regulatory stewardship to monitor interest rate ceilings and foster a more nuanced and diversified product portfolio that ensures the holistic welfare of its recipients.

উত্তর:

নিঃসন্দেহে বাংলাদেশ আধুনিক ক্ষুদ্রঋণ আন্দোলনের সূতিকাগার, যেখানে আর্থিকভাবে পিছিয়ে পড়া মানুষের জন্য জামানতবিহীন ঋণের ব্যবস্থা এক সর্বজনীন আর্থিক কাঠামোতে পরিণত হয়েছে, যার লক্ষ্য হলো দরিদ্রদের সুপ্ত উদ্যোগী ক্ষমতাকে জাগ্রত করে তাদের দারিদ্র্যসীমা অতিক্রম করতে সাহায্য করা। প্রাপ্ত তথ্য থেকে সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণিত যে, দারিদ্র্য বিমোচনে ক্ষুদ্রঋণের একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে, যেটি মানুষের পারিবারিক আয় উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি করতে এবং নারী উদ্যোক্তাদের অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নকে শক্তিশালী করে, কারণ ক্ষুদ্রঋণগ্রহীতাদের সিংহভাগই নারী। তবে, এই ক্ষেত্রটিও সমস্যাসঙ্কুল নয়। সমালোচকেরা প্রায়শই উচ্চ সুদের হারের স্থায়িত্ব নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেন, যা ঋণগ্রহীতাদের একটি অংশকে ক্ষতিকর ঋণেরজালে জড়িয়ে ফেলতে পারে, তাছাড়া চরম দরিদ্রদের আর্থিক চাহিদা পূরণের ক্ষেত্রে এই ব্যবস্থার সক্ষমতা নিয়েও একটি বিতর্ক বিদ্যমান। ফলস্বরূপ, ক্ষুদ্রঋণ যদিও অন্তর্ভুক্তিমূলক আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের জন্য একটি মূল চালিকাশক্তি, এর ভবিষ্যৎ কার্যকারিতা নির্ভর করছে কঠোর নিয়ন্ত্রক পর্যবেক্ষণের ওপর—যাতে সুদের হার একটি নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে থাকে এবং একটি আরও সূক্ষ্ম ও বহুমুখী পণ্য তালিকা তৈরি করা যায়, যা সুবিধাভোগীদের সামগ্রিক কল্যাণ নিশ্চিত করবে।

৩. **প্রবন্ধ রচনা লিখুন :** (যে কোনো একটি) ৪০

** নির্দেশনা :

i. প্রতিটি ভুল বানানের জন্য ০.২৫ নম্বর কাটা যাবে।

ii. প্রশ্নের সাথে প্রাসঙ্গিক লিখলে সর্বোচ্চ ২৪ - ২৫ দিতে পারেন, সর্বনিম্ন ৮ - ১০, এভারেজ নম্বর ১৭ - ১৮।

iii. রচনায় তথ্য সংযোজন ও চিত্র (প্রয়োজনে), প্রাসঙ্গিক উদ্ধৃতি এবং উদাহরণসহ লেখার জন্য বলতে পারেন।

ক. বাঙালির ঐতিহ্য ও কৃষ্টি

নমুনা উত্তর:

ভূমিকা: বাঙালি জাতিসত্তা পৃথিবীর অন্যতম প্রাচীন ও স্বতন্ত্র সাংস্কৃতিক পরিচয়ের ধারক। সুদীর্ঘ ইতিহাসের পথপরিক্রমায়, নদীবিধৌত এই ব-দ্বীপে জন্ম নেওয়া এক মিশ্র জাতিগোষ্ঠীর জীবনযাত্রা, চিন্তা-চেতনা, শিল্প ও দর্শনকে অবলম্বন করে বাঙালির যে ঐতিহ্য ও কৃষ্টি গড়ে উঠেছে, তা এক কথায় অতুলনীয়। এই সংস্কৃতি কেবল অতীতের স্মৃতি নয়, বরং তা বাঙালির মনন ও মূল্যবোধের এক জীবন্ত দলিল।

১. ঐতিহ্য ও কৃষ্টির স্বরূপ এবং ভৌগোলিক ভিত্তি

ঐতিহ্য হলো পূর্বপুরুষদের কাছ থেকে প্রাপ্ত জীবনধারা, যা জাতি হিসেবে বাঙালির মূল ভিত্তি রচনা করেছে। কৃষ্টি হলো এই ঐতিহ্যের পরিশীলিত ও সৃজনশীল বহিঃপ্রকাশ, যা শিল্পকলা, সাহিত্য, সংগীত এবং দর্শনের মাধ্যমে বিকশিত।

ক. প্রকৃতি ও জীবনের সম্পর্ক

বাঙালির কৃষ্টির প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো প্রকৃতি নির্ভরতা। গঙ্গা-পদ্মা-মেঘনার উর্বর পলিমাটি এবং ছয় ঋতুর বৈচিত্র্য বাঙালির জীবনকে করেছে কোমল ও সহনশীল। এই অঞ্চলের কৃষিভিত্তিক অর্থনীতি ও প্রকৃতির সাথে মানুষের নিবিড় সম্পর্কই বাঙালির লোকায়ত সংস্কৃতিকে পুষ্ট করেছে। প্রকৃতি এখানে কেবল পটভূমি নয়, বরং জীবনের অংশীদার।

খ. মিশ্র জাতিসত্তা ও ধর্মীয় বহুত্ববাদ

বাঙালি জাতি আর্য, দ্রাবিড়, মঙ্গল ও অস্ট্রালয়েডসহ বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর সংমিশ্রণে গঠিত। ইসলামের উদারতা, বৈষ্ণব ধর্মের প্রেম এবং সহজিয়া বৌদ্ধ ও নাথ ধর্মের প্রভাব—সবই বাঙালির মননকে প্রভাবিত করেছে। ফলে বাঙালির ঐতিহ্য কখনোই একমুখী বা গোঁড়া হতে পারেনি; বরং তা হয়ে উঠেছে বহুত্ববাদী, সহনশীল ও অসাম্প্রদায়িক, যা এই কৃষ্টির প্রধানতম শক্তি।

২. কৃষ্টির কেন্দ্রবিন্দু: ভাষা ও সাহিত্য

ক. ভাষার জন্য আত্মত্যাগ

পৃথিবীতে বাংলাই একমাত্র ভাষা, যা নিজের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য রক্ত দিয়েছে। ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন ছিল কেবল মাতৃভাষার মর্যাদা রক্ষার সংগ্রাম নয়, এটি ছিল বাঙালি জাতীয়তাবাদের প্রথম সার্থক জাগরণ। এই আত্মত্যাগ আজ বিশ্বজুড়ে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে পালিত হয়, যা বাঙালির ঐতিহ্যের এক বিরল স্বাক্ষর।

খ. সাহিত্য ও মননশীলতার বিকাশ

বাঙালির সাহিত্যিক ঐতিহ্য প্রায় হাজার বছরের পুরনো। চর্যাপদ থেকে শুরু করে মধ্যযুগে শ্রীকৃষ্ণকীর্তন, মঙ্গলকাব্য, ও বৈষ্ণব পদাবলীর মাধ্যমে বাঙালির আধ্যাত্মিক ও লৌকিক জীবনের ছবি ফুটে উঠেছে।

আধুনিক যুগে, মাইকেল মধুসূদন দত্ত ইউরোপীয় রীতির সাথে দেশীয় আবেগকে যুক্ত করে নতুন দিগন্ত উন্মোচন করেন। এরপর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর কবিতা, গান, উপন্যাস ও দর্শনের মধ্য দিয়ে বাঙালি সংস্কৃতিকে বিশ্বসভায় প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর বিশ্বকবি খেতাব অর্জন বাঙালির মননশীলতার আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি। পাশাপাশি কাজী নজরুল ইসলাম তাঁর বিদ্রোহী ও সাম্যবাদী চেতনা দিয়ে বাঙালির সংস্কৃতিতে এক নতুন গতি ও শক্তি সঞ্চার করেন। এছাড়া শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়-এর মতো সাহিত্যিকেরা গ্রামীণ ও নাগরিক জীবনের জটিলতা ফুটিয়ে তুলেছেন।

৩. লোকায়ত ঐতিহ্য ও জীবনধারা

ক. লোকসংগীত ও নৃত্য : বাঙালির লোকসংগীত অত্যন্ত সমৃদ্ধ। এগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে-

বাউল গান : এটি কেবল গান নয়, এটি বাঙালি লোকদর্শনের সর্বোচ্চ প্রকাশ। লালন সাঁই-এর বাউল গান জাতি-ধর্মের ঊর্ধ্বে উঠে মানবাত্মার সন্ধান করে এবং তা আজও বাঙালির জীবনবোধকে প্রভাবিত করে।

ভাটিয়ালি ও ভাওয়াইয়া : নদীমাতৃক অঞ্চলের ভাটিয়ালি (নদীর মাঝি ও নিঃসঙ্গতার গান) এবং উত্তরবঙ্গের ভাওয়াইয়া (গাড়িওয়ালার জীবন ও প্রেমের গান) বাঙালির প্রকৃতি নির্ভর জীবনযাত্রার প্রতিফলন।

জারি ও সারি গান: শ্রমজীবী মানুষের সম্মিলিত কাজের উদ্দীপনা থেকে জন্ম নেওয়া এই গানগুলি বাংলার লোকনৃত্যেরও অংশ।

খ. লোকশিল্প ও কারুশিল্প : বাঙালির লোকশিল্প তার নান্দনিকতা ও উপযোগিতার জন্য বিখ্যাত।

নকশি কাঁথা: এটি শুধুমাত্র একটি আচ্ছাদন নয়, এটি বাঙালির নারীদের নীরব আত্মজীবনী ও শিল্পসৃষ্টির প্রতীক। কাঁথায় সেলাইয়ের মাধ্যমে ফুটে ওঠে পারিবারিক কাহিনি, লোকপুরাণ ও প্রকৃতির রূপ।

পটের গান ও পটচিত্র: লোকসমাজের কাহিনি ও ধর্মীয় উপাখ্যান চিত্রাঙ্কনের মাধ্যমে ফুটিয়ে তোলার এই ঐতিহ্য আজও গ্রামীণ মেলা ও হাটে দেখা যায়।

মাটির কাজ ও মৃৎশিল্প: পুতুল, হাঁড়ি, সরা ইত্যাদির মধ্য দিয়ে মৃৎশিল্পীরা প্রকৃতির সাথে জীবনের এক সরল সংযোগ স্থাপন করেন।

গ. উৎসব ও পার্বণ: বাঙালির সংস্কৃতিতে উৎসবের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, যা সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির প্রধান মঞ্চ।

পহেলা বৈশাখ (নববর্ষ): এটি বাঙালি জাতির সর্বজনীন ও শ্রেষ্ঠ অসাম্প্রদায়িক উৎসব। এই দিনে ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকলে মিলেমিশে নতুন বছরকে বরণ করে নেয়। মঙ্গল শোভাযাত্রা এই উৎসবের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হিসেবে ইউনেস্কোর ইনট্যানজিবল কালচারাল হেরিটেজ মর্যাদা লাভ করেছে, যা বাঙালির সংস্কৃতিকে আন্তর্জাতিক পরিচিতি দিয়েছে।

নবান্ন উৎসব: কৃষিভিত্তিক সমাজের প্রধান উৎসব এটি। নতুন ধান ওঠার পর এই উৎসবের আয়োজন করা হয়, যেখানে পিঠা-পুলি তৈরি এবং লোকনৃত্যের মাধ্যমে আনন্দ প্রকাশ করা হয়।

ধর্মীয় উৎসব: ঈদ, দুর্গাপূজা, বড়দিন এবং বৌদ্ধ পূর্ণিমা—সকল ধর্মীয় উৎসবেই অন্য ধর্মের মানুষের অংশগ্রহণের প্রবণতা দেখা যায়, যা বাঙালির 'মিলেমিশে থাকা' ঐতিহ্যকে তুলে ধরে।

৪. বাঙালির জীবনবোধ ও মূল্যবোধের ঐতিহ্য : বাঙালির ঐতিহ্য কেবল বাহ্যিক আচার-আচরণে সীমাবদ্ধ নয়, এর একটি গভীর জীবনবোধ ও দার্শনিক ভিত্তি রয়েছে।

ক. মানবতাবাদ ও উদারতা : বাঙালি সংস্কৃতিতে মানবিক মূল্যবোধ সবসময় প্রাধান্য পেয়েছে। লালন শাহ, হাসন রাজা, কাঙাল হরিনাথের মতো সাধক-কবিরা তাঁদের দর্শনে ধর্ম, জাতি, ও গোত্রের ভেদাভেদকে তুচ্ছ করে বিশুদ্ধ মানবতাবাদকে তুলে ধরেছেন। এই উদারতা ও সহনশীলতা বাঙালিকে সকল প্রকার ধর্মীয় গোঁড়ামি থেকে মুক্ত রাখতে সাহায্য করেছে।

খ. খাদ্য ও রন্ধন কৃষ্টি : "মাছে-ভাতে বাঙালি" এই প্রবাদটি বাঙালির খাদ্যাভ্যাসের প্রধান পরিচয়। নদী ও জলাধারের প্রাচুর্য মাছকে বাঙালির প্রধান খাদ্যে পরিণত করেছে। এছাড়া, মিষ্টির প্রতি বাঙালির আকর্ষণ ঐতিহাসিক। হরেক রকমের পিঠা-পুলি ও পায়েস বাঙালির রন্ধন কৃষ্টির অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অংশ।

গ. পোশাক ও রুচি : পোশাকের ক্ষেত্রেও বাঙালির নিজস্ব ঐতিহ্য রয়েছে। পুরুষদের ধুতি ও পাঞ্জাবি এবং নারীদের শাড়ি বাঙালির চিরায়ত পোশাক। শাড়ির বৈচিত্র্যময় বুনন (যেমন জামদানি, টাঙ্গাইল) বাঙালির সৃজনশীলতা ও রুচির পরিচায়ক।

৫. ঐতিহ্য সংরক্ষণের চ্যালেঞ্জ ও গুরুত্ব : বিশ্বায়ন, পুঁজিবাদের আগ্রাসন এবং প্রযুক্তিনির্ভর আধুনিক জীবনধারার প্রভাবে বাঙালির ঐতিহ্য ও কৃষ্টি আজ নানা চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন। দ্রুত পরিবর্তনশীল সামাজিক কাঠামোয় লোকশিল্প, লোকসংগীত এবং চিরায়ত লোকাচারগুলি বিলুপ্তির পথে। নতুন প্রজন্মের কাছে এই ঐতিহ্যের গুরুত্ব তুলে ধরা এখন জরুরি।

ঐতিহ্য ও কৃষ্টির সংরক্ষণ কেবল অতীতকে ধরে রাখা নয়, এটি জাতীয় আত্মপরিচয়কে শক্তিশালী করার একটি প্রক্রিয়া। এই ঐতিহ্যই বাঙালির মননশীলতার ভিত্তি এবং ভবিষ্যৎ সৃজনশীলতার মূল উৎস। বাঙালির সংস্কৃতিতে নিহিত অসাম্প্রদায়িক চেতনা ও মানবতাবাদী দর্শন আজকের বিশ্বেও অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক ও প্রয়োজনীয়। এই ঐতিহ্যকে শিক্ষা, গণমাধ্যম ও সাংস্কৃতিক চর্চার মাধ্যমে বাঁচিয়ে রাখলেই বাঙালি জাতি বিশ্বে তার স্বতন্ত্র আসন ধরে রাখতে সক্ষম হবে।

উপসংহার : বাঙালির ঐতিহ্য ও কৃষ্টি হলো শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে গড়ে ওঠা এক জীবন্ত মহাকাব্য। ভাষা, সাহিত্য, শিল্প, লোকবিশ্বাস এবং উৎসব—সবকিছু মিলিয়ে বাঙালি এক অনন্য সাংস্কৃতিক ঐশ্বর্যের অধিকারী। এই ঐতিহ্য বাঙালিকে তার কঠিনতম মুহূর্তেও প্রেরণা জুগিয়েছে—৫২'র ভাষা আন্দোলন থেকে শুরু করে ৭১'র স্বাধীনতা সংগ্রাম পর্যন্ত। বাঙালির সংস্কৃতি সহনশীল, মানবিক এবং অসাম্প্রদায়িকতার যে বার্তা বহন করে, তা কেবল বাঙালির জন্য নয়, সমগ্র বিশ্বের জন্য এক অনুসরণীয় দৃষ্টান্ত। এই অমূল্য কৃষ্টিকে ভবিষ্যতের হাতে তুলে দেওয়ার মাধ্যমেই বাঙালি জাতি তার অস্তিত্ব ও গৌরবকে চিরন্তন করে রাখতে পারে।

খ. বাংলাদেশের পুরাকীর্তি

নমুনা উত্তর:

ভূমিকা : বাংলাদেশ একটি নবীন রাষ্ট্র হলেও এর ভূখণ্ডে মানববসতি ও সভ্যতার ইতিহাস সুপ্রাচীন। সুদীর্ঘকাল ধরে এই ব-দ্বীপে নানা জাতি, ধর্ম ও সংস্কৃতির মিলন ঘটেছে, যার ফলস্বরূপ গড়ে উঠেছে এক সমৃদ্ধ পুরাতাত্ত্বিক ঐতিহ্য। বাংলার অতীত গৌরব, স্থাপত্যশৈলী, ধর্মীয় বিশ্বাস ও শিল্পকলার অপূর্ব নিদর্শন হিসেবে এই পুরাকীর্তিগুলো আজও মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে। এসব পুরাকীর্তি শুধু ইট-পাথরের কাঠামো নয়, বরং তারা আমাদের জাতীয় ইতিহাসের জীবন্ত দলিল।

১. পুরাকীর্তির সংজ্ঞা ও গুরুত্ব : পুরাকীর্তি বলতে বোঝায় মানব ইতিহাসের প্রাচীন নিদর্শনসমূহ, যা স্থাপত্য, ভাস্কর্য, মৃৎশিল্প বা অন্য কোনো রূপরেখার মাধ্যমে অতীতের সভ্যতা, সংস্কৃতি ও জীবনধারা সম্পর্কে ধারণা দেয়।

ক. পুরাকীর্তির গুরুত্ব : ইতিহাসের উৎস: প্রাচীন রাজবংশ, তাদের শাসনকাল, অর্থনীতি, ধর্ম ও সামাজিক জীবন সম্পর্কে জানার প্রধানতম উৎস হলো এই পুরাকীর্তি।
সাংস্কৃতিক পরিচয় : এগুলো একটি জাতির সাংস্কৃতিক পরিচয় ও ঐতিহ্যের ধারক। পুরাকীর্তিগুলো বাঙালির শিকড়ের সন্ধান দেয়।
পর্যটন ও অর্থনীতি : দেশের বিভিন্ন পুরাকীর্তি স্থানগুলো দেশি-বিদেশি পর্যটকদের আকর্ষণ করে, যা স্থানীয় ও জাতীয় অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।
স্থাপত্য ও শিল্পকলার নিদর্শন: প্রাচীন স্থাপত্যশৈলী, নির্মাণকৌশল এবং ভাস্কর্য শিল্পের উচ্চমান প্রদর্শন করে।

খ. পুরাকীর্তির শ্রেণীবিভাগ : বাংলাদেশের পুরাকীর্তি প্রধানত তিনটি বৃহৎ শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়: ১. প্রাচীন বৌদ্ধ বিহার ও মঠ: (যেমন, পাহাড়পুর, মহাস্থানগড়)। ২. সুলতানি ও মুঘল আমলের স্থাপত্য: (যেমন, মসজিদ, দুর্গ, মকবরা)। ৩. উপনিবেশিক আমলের স্থাপনা: (যেমন, জমিদার বাড়ি, গীর্জা, ইউরোপীয় স্থাপত্য)।

২. প্রাচীন আমলের পুরাকীর্তি (খ্রিস্টপূর্ব ৩য় শতক থেকে ১২০০ খ্রিষ্টাব্দ)
বাংলাদেশের প্রাচীনতম পুরাকীর্তিগুলো মূলত বৌদ্ধ ও হিন্দু ধর্মকেন্দ্রিক এবং নগর সভ্যতার নিদর্শন।

ক. মহাস্থানগড়, বগুড়া : বাংলার প্রাচীনতম নগরী
বগুড়ার মহাস্থানগড় বাংলাদেশের সবচেয়ে প্রাচীন ও গুরুত্বপূর্ণ প্রত্নতাত্ত্বিক স্থান। এটি খ্রিস্টপূর্ব তৃতীয় শতক থেকে শুরু করে প্রায় আঠারো শতক পর্যন্ত বিভিন্ন রাজবংশের রাজধানী ছিল।
নাম: প্রাচীন নাম ছিল পুন্ড্রনগর বা পুন্ড্রবর্ধন।
নিদর্শন: মাটির উঁচু ঢিবি, দুর্গ প্রাচীর, খোদাই করা শিলালিপি (যেমন, ব্রাহ্মী লিপিতে লেখা চুনাপাথরের লিপি), গোবিন্দ ভিটা, বেহুলার বাসর ঘর (স্থানীয়ভাবে পরিচিত), এবং একটি বিশাল প্রত্নতাত্ত্বিক জাদুঘর। এটি বাংলার প্রথম নগর সভ্যতার পরিচয় বহন করে।

খ. পাহাড়পুর বৌদ্ধ বিহার, নওগাঁ : সোমপুর মহাবিহার নওগাঁ জেলার পাহাড়পুরে অবস্থিত সোমপুর মহাবিহার পাল সাম্রাজ্যের দ্বিতীয় রাজা ধর্মপাল অষ্টম শতকে নির্মাণ করেন। এটি ইউনেস্কো কর্তৃক ঘোষিত একটি বিশ্ব ঐতিহ্যবাহী স্থান (World Heritage Site)।

স্থাপত্য: এটি ছিল পৃথিবীর বৃহত্তম বৌদ্ধ বিহারগুলির মধ্যে অন্যতম। এর প্রধান স্থাপত্যশৈলী হলো ক্রুশাকৃতির (Cruciform) কাঠামো, যার কেন্দ্রস্থলে একটি বিশাল মন্দির বা স্তূপ ছিল।

গুরুত্ব: বিহারটি ভারতীয় উপমহাদেশে বৌদ্ধধর্মের জ্ঞানচর্চার এক বিশাল কেন্দ্র ছিল। এর দেয়ালগাত্রে পোড়ামাটির ফলকগুলিতে তৎকালীন সমাজ ও সংস্কৃতির চিত্র, পৌরাণিক কাহিনি এবং প্রাণীজগতের দৃশ্যাবলী খোদাই করা আছে।

গ. ময়নামতি, কুমিল্লা : বৌদ্ধ জ্ঞানচর্চার কেন্দ্র কুমিল্লার ময়নামতি অঞ্চলে একাধিক বৌদ্ধ বিহার, মঠ ও স্তূপের ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হয়েছে, যার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো শালবন বিহার এবং আনন্দ বিহার।
সময়কাল : এটি সপ্তম থেকে দ্বাদশ শতকের মধ্যে দেববংশ ও চন্দ্রবংশের শাসনাধীন ছিল।
নিদর্শন : বিহারগুলোর স্থাপত্যশৈলী পাহাড়পুরের সোমপুর মহাবিহারের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। খননকার্যের ফলে এখানে স্বর্ণ ও রৌপ্য মুদ্রা, ব্রোঞ্জের মূর্তি এবং পোড়ামাটির ফলক পাওয়া গেছে, যা তৎকালীন বৌদ্ধ ধর্মীয় কৃষ্টির পরিচয় দেয়।

৩. মধ্যযুগের পুরাকীর্তি (১২০০ থেকে ১৭৫৭ খ্রিষ্টাব্দ)
মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠার পর বাংলার পুরাকীর্তিতে ইসলামিক স্থাপত্যের প্রভাব পড়ে। এই সময়ের স্থাপত্যগুলি মূলত মসজিদ, মকবরা, দুর্গ এবং নগরকেন্দ্রিক।

ক. বাগেরহাটের ষাট গম্বুজ মসজিদ ও খান জাহান আলী
বাগেরহাটে অবস্থিত ষাট গম্বুজ মসজিদ (আসলে এর গম্বুজের সংখ্যা ৮১) বাংলার সুলতানি আমলের স্থাপত্যের এক অসাধারণ নিদর্শন। এটিও ইউনেস্কো বিশ্ব ঐতিহ্যবাহী স্থান হিসেবে স্বীকৃত।
নির্মাতা : প্রখ্যাত সুফি সাধক খান জাহান আলী পঞ্চদশ শতকে এটি নির্মাণ করেন।

স্থাপত্য : মসজিদটির স্থাপত্যে স্থানীয় ও তুর্কি রীতির এক চমৎকার মিশ্রণ দেখা যায়। বিশাল আকারের এই মসজিদটি সুলতানি আমলের সবচেয়ে বড় মসজিদ। বাগেরহাটে তাঁর মকবরা বা সমাধিসৌধও এই সময়ের গুরুত্বপূর্ণ নিদর্শন।

খ. গৌড়-পাণ্ডুয়ার স্থাপত্য : বাংলার রাজধানী একসময় গৌড় ও পাণ্ডুয়া ছিল বাংলার স্বাধীন সুলতানদের রাজধানী। এই অঞ্চলে বহু মসজিদ ও স্থাপত্যের ধ্বংসাবশেষ রয়েছে।

নিদর্শন : ছোট সোনা মসজিদ, বড় সোনা মসজিদ, কদম রসুল ভবন, লোটন মসজিদ, ফিরোজ মিনার—এগুলো সুলতানি স্থাপত্যের সৌন্দর্য ও দৃঢ়তার পরিচয় দেয়। এই স্থাপত্যে পোড়ামাটির কাজ এবং পাথর খোদাইয়ের সূক্ষ্ম কাজ দেখা যায়।

গ. মুঘল স্থাপত্য : ঢাকা ও অন্যান্য স্থান মুঘল আমলে (সপ্তদশ শতক) স্থাপত্যের মূল কেন্দ্র ছিল ঢাকা। এই সময়ের স্থাপত্যে দৃঢ়তা এবং অলংকরণের ওপর জোর দেওয়া হয়।

লালবাগ কেল্লা, ঢাকা : এটি সম্রাট আওরঙ্গজেবের পুত্র যুবরাজ আযম শাহ কর্তৃক ১৭ শতকে নির্মিত একটি অসম্পূর্ণ দুর্গ। এর মধ্যে রয়েছে পরী বিবির মকবরা, দরবার হল, এবং একটি হাম্মামখানা। এটি মুঘল আমলের সামরিক ও আবাসিক স্থাপত্যের প্রতিনিধিত্ব করে।

আতিয়া জামে মসজিদ, টাঙ্গাইল : এটি মুঘল স্থাপত্যশৈলীতে নির্মিত একটি সুন্দর মসজিদ। হোসেনী দালান, ঢাকা: এটি শিয়া সম্প্রদায়ের জন্য নির্মিত একটি গুরুত্বপূর্ণ ধর্মীয় স্থাপত্য।

৪. উপনিবেশিক আমলের পুরাকীর্তি (১৭৫৭ থেকে ১৯৪৭ খ্রিষ্টাব্দ)
ব্রিটিশ ও অন্যান্য ইউরোপীয় শক্তিগুলোর প্রভাবে এই সময়ের স্থাপত্যে ইউরোপীয়, গথিক ও ইন্দো-সারাসেনিক রীতির মিশ্রণ ঘটে।

ক. জমিদার বাড়ি ও রাজবাড়ি : উপনিবেশিক আমলে জমিদার ও রাজা-মহারাজারা বিলাসবহুল প্রাসাদ ও বাড়ি নির্মাণ করেন।

আহসান মঞ্জিল, ঢাকা: এটি ছিল ঢাকার নবাবদের সরকারি বাসভবন। ইন্দো-সারাসেনিক রীতির এই স্থাপত্য বুড়িগঙ্গার তীরে ঢাকার আভিজাত্যের প্রতীক।

সোনারগাঁও পানাম নগর: এটি ছিল মসলিন ব্যবসার কেন্দ্র। এখানে ইউরোপীয় স্থাপত্য রীতির মিশ্রণে নির্মিত সারি সারি ঔপনিবেশিক ধাঁচের বাড়িঘর দেখা যায়, যা একসময় ধনী ব্যবসায়ীদের আবাস ছিল।

নাটোর রাজবাড়ি, দিঘাপতিয়া রাজবাড়ি (উত্তরা গণভবন): এগুলো তৎকালীন জমিদারদের ক্ষমতা ও ঐশ্বর্যের প্রতীক।
খ. স্থাপত্যিক নিদর্শন
কার্জন হল, ঢাকা: ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক স্থাপত্যের এক চমৎকার উদাহরণ, যা বর্তমানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অংশ। পুরাতন হাইকোর্ট ভবন (ইডেন বিল্ডিং), ঢাকা: ইন্দো-সারাসেনিক রীতির একটি অন্যতম প্রধান স্থাপনা।

৫. পুরাকীর্তি সংরক্ষণের চ্যালেঞ্জ ও উদ্যোগ: বাংলাদেশের পুরাকীর্তিগুলো আবহাওয়া, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, অপরিকল্পিত নগরায়ণ এবং রক্ষণাবেক্ষণের অভাবের কারণে মারাত্মক হুমকির মুখে।

ক. চ্যালেঞ্জসমূহ
জলবায়ু পরিবর্তন: আর্দ্রতা, লবণাক্ততা এবং বন্যার কারণে মাটির নিচে থাকা প্রাচীন কাঠামোগুলি দ্রুত ক্ষয়প্রাপ্ত হচ্ছে।
মানবসৃষ্ট ক্ষতি: ভূমিদস্যুতা, অবৈধ দখল এবং অপরিকল্পিত সংস্কারের ফলে বহু প্রত্নস্থান ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।
অর্থনৈতিক সীমাবদ্ধতা: বিশাল সংখ্যক পুরাকীর্তি রক্ষণাবেক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ, প্রযুক্তি ও প্রশিক্ষিত জনবলের অভাব রয়েছে।
জনসচেতনতার অভাব: অনেক সময় স্থানীয় জনগণ পুরাকীর্তির গুরুত্ব বুঝতে না পারায় সেগুলো ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

খ. সরকারি ও আন্তর্জাতিক উদ্যোগ
প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর: প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর এই সম্পদ রক্ষায় প্রধান ভূমিকা পালন করে। তারা সংরক্ষণ, খনন ও গবেষণা কার্যক্রম পরিচালনা করে।
আইন প্রণয়ন: পুরাকীর্তি সংরক্ষণ আইন দ্বারা এই স্থানগুলো সুরক্ষিত করা হয়েছে।
ইউনেস্কোর সহযোগিতা: পাহাড়পুর ও ষাট গম্বুজ মসজিদের মতো স্থানগুলোর রক্ষণাবেক্ষণে ইউনেস্কো সহায়তা করছে।
আধুনিক প্রযুক্তি: ডিজিটাল ডকুমেন্টেশন, লেজার স্ক্যানিং এবং রাসায়নিক সংরক্ষণের মতো আধুনিক পদ্ধতি ব্যবহার করে নিদর্শনগুলো সংরক্ষণের উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে।

৬. উপসংহার : বাংলাদেশের পুরাকীর্তিগুলো কেবল অতীতের স্থাপত্যিক নিদর্শন নয়, বরং এগুলি আমাদের জাতীয় ইতিহাস, ধর্মীয় সহনশীলতা এবং শিল্পকলার উৎকর্ষের প্রতীক। মহাস্থানগড়ের ব্রাহ্মী লিপি থেকে শুরু করে পাহাড়পুরের বিহারের ফলকচিত্র, ষাট গম্বুজের বিশালতা, এবং মুঘল-উপনিবেশিক রীতির চমৎকার স্থাপত্য—প্রতিটিই বাঙালির গৌরবময় অতীতকে স্মরণ করিয়ে দেয়।

এই অমূল্য সাংস্কৃতিক সম্পদকে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য বাঁচিয়ে রাখা আমাদের জাতীয় দায়িত্ব। কঠোর আইন প্রয়োগ, নিয়মিত রক্ষণাবেক্ষণ, আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার এবং সর্বোপরি, জনসচেতনতা বৃদ্ধি—এই পদক্ষেপগুলির মাধ্যমে বাংলাদেশের পুরাকীর্তিগুলো তাদের ঐতিহাসিক গুরুত্ব নিয়ে কালের বুকে চিরঞ্জীব থাকবে। এই পুরাকীর্তিগুলো শুধু পর্যটন শিল্পকে সমৃদ্ধ করে না, বরং বিশ্বসভায় বাঙালির স্বতন্ত্র পরিচিতিকে আরও দৃঢ় করে তোলে।

গ. জলবায়ু পরিবর্তন ও বাংলাদেশ

ভূমিকা : জলবায়ু পরিবর্তন বর্তমান বিশ্বের সবচেয়ে আলোচিত ও প্রকট সমস্যাগুলোর মধ্যে অন্যতম। বায়ুমণ্ডলে গ্রিনহাউস গ্যাসের মাত্রাতিরিক্ত নির্গমনের ফলে বৈশ্বিক উষ্ণায়ন বৃদ্ধি পাচ্ছে, যার সুদূরপ্রসারী ও মারাত্মক পরিণতি ভোগ করছে পুরো বিশ্ব। এই বিশ্বব্যাপী সংকটের কেন্দ্রে অবস্থান করছে বাংলাদেশ—ভৌগোলিক অবস্থান, জনঘনত্ব ও অর্থনৈতিক দুর্বলতার কারণে দেশটি জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে বিশ্বের সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ দেশগুলোর তালিকায় শীর্ষে। এই প্রবন্ধ জলবায়ু পরিবর্তনের স্বরূপ, এর বৈশ্বিক প্রেক্ষাপট, বাংলাদেশের ওপর এর বহুমুখী প্রভাব এবং এই চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় গৃহীত পদক্ষেপ ও করণীয় বিষয়াদি বিশদভাবে আলোচনা করবে।

১. জলবায়ু পরিবর্তন কী এবং এর কারণ : জলবায়ু পরিবর্তন হলো দীর্ঘমেয়াদী ভিত্তিতে আবহাওয়ার ধরণে আসা গুরুতর ও স্থায়ী পরিবর্তন। বিগত দেড় শতাব্দী ধরে এই পরিবর্তন মূলত মানুষের কর্মকাণ্ড, বিশেষত শিল্পবিপ্লবের পর থেকে জীবাশ্ম জ্বালানির (কয়লা, তেল, গ্যাস) ব্যাপক ব্যবহার এবং বন উজাড়ের কারণে সৃষ্ট।

ক. গ্রিনহাউস প্রভাব ও বৈশ্বিক উষ্ণায়ন : জলবায়ু পরিবর্তনের প্রধান কারণ হলো বায়ুমণ্ডলে কার্বন ডাই-অক্সাইড, মিথেন এবং নাইট্রাস অক্সাইডের মতো গ্রিনহাউস গ্যাস জমা হওয়া। এই গ্যাসগুলো সূর্যের তাপকে পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে আটকে রাখে, যার ফলে পৃথিবীর গড় তাপমাত্রা বৃদ্ধি পায়। একেই বৈশ্বিক উষ্ণায়ন বলা হয়। বৈশ্বিক উষ্ণায়ন মেরু অঞ্চলের বরফ গলে যাওয়া, সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি এবং আবহাওয়ার চরমভাবাপন্নতা বৃদ্ধি করে।

খ. বৈশ্বিক প্রেক্ষাপট : জলবায়ু পরিবর্তনের শিকার মূলত দরিদ্র ও উন্নয়নশীল দেশগুলো হলেও, এর জন্য দায়ী প্রধানত উন্নত ও শিল্পোন্নত দেশগুলো। বিশ্বের ধনী দেশগুলো ঐতিহাসিকভাবে সর্বাধিক গ্রিনহাউস গ্যাস নিঃসরণ করেছে। জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবিলায় আন্তর্জাতিক উদ্যোগের মধ্যে প্যারিস চুক্তি (২০১৫) সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, যেখানে বৈশ্বিক তাপমাত্রা বৃদ্ধি প্রাক-শিল্প স্তরের তুলনায় ২ ডিগ্রি সেলসিয়াসের নিচে রাখার লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে।

২. বাংলাদেশের ওপর জলবায়ু পরিবর্তনের বহুমুখী প্রভাব : বাংলাদেশ ভৌগোলিকভাবেই জলবায়ু পরিবর্তনজনিত ঝুঁকির এক "হটস্পট"। দেশের প্রায় ৭০% অঞ্চল সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে মাত্র কয়েক মিটার উঁচুতে অবস্থিত হওয়ায় এই ঝুঁকি বহুগুণ বেড়ে গেছে।

ক. সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি ও উপকূলীয় জীবনযাত্রা : জলবায়ু পরিবর্তনের সবচেয়ে মারাত্মক প্রভাবটি হলো সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি। IPCC-এর প্রতিবেদন অনুযায়ী, বর্তমান হারে সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বাড়লে ২০৫০ সাল নাগাদ বাংলাদেশের এক-পঞ্চমাংশ এলাকা স্থায়ীভাবে জলমগ্ন হতে পারে।
স্থলভূমির বিলুপ্তি : এতে দেশের উপকূলীয় অঞ্চলের কৃষি জমি, মিষ্টি পানির উৎস এবং মানববসতি জলের নিচে চলে যাবে।

লবণাক্ততা বৃদ্ধি : সমুদ্রের নোনা জল নদী ও ভূগর্ভস্থ জলস্তরে প্রবেশ করে কৃষিকাজ ও পানীয় জলের সংকট সৃষ্টি করছে। বিশেষ করে দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের খুলনা, সাতক্ষীরা ও বাগেরহাট জেলা এর শিকার।
খ. ঘূর্ণিঝড় ও প্রাকৃতিক দুর্যোগের তীব্রতা : জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে বঙ্গোপসাগরে ঘূর্ণিঝড়ের সংখ্যা ও তীব্রতা উভয়ই বেড়েছে। সমুদ্রের উষ্ণতা বৃদ্ধি ঘূর্ণিঝড়কে আরও শক্তিশালী ও ধ্বংসাত্মক করে তুলছে।
ঘন ঘন আঘাত : সিডর, আইলা, ফণি, আম্ফান, ও সিত্রাং-এর মতো ভয়াবহ ঘূর্ণিঝড়গুলো স্বল্প সময়ের ব্যবধানে উপকূলীয় জনপদে আঘাত হেনে ব্যাপক প্রাণহানি ও অর্থনৈতিক ক্ষতি করেছে।
জলোচ্ছ্বাস : ঘূর্ণিঝড়ের সাথে সৃষ্ট উচ্চ জলোচ্ছ্বাস দুর্বল বাঁধ অতিক্রম করে উপকূলের বিস্তীর্ণ অঞ্চল প্লাবিত করছে।

গ. কৃষি ও খাদ্য নিরাপত্তা : বাংলাদেশের অর্থনীতি মূলত কৃষিনির্ভর। জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব সরাসরি খাদ্য নিরাপত্তাকে হুমকির মুখে ফেলছে।

অনিয়মিত বৃষ্টিপাত : অসময়ে বন্যা, খরা এবং অনিয়মিত বৃষ্টিপাতের কারণে ফসলের স্বাভাবিক উৎপাদন ব্যাহত হচ্ছে। বিশেষ করে খরাপ্রবণ বরেন্দ্র অঞ্চলে কৃষি উৎপাদন হ্রাস পাচ্ছে।

রোগ ও কীটনাশকের আক্রমণ : তাপমাত্রা বৃদ্ধির ফলে ফসল ও গবাদি পশুর রোগ এবং পোকামাকড়ের আক্রমণ বাড়ছে।

ঘ. স্বাস্থ্য ও জনজীবন : তাপমাত্রা বৃদ্ধি এবং আবহাওয়ার চরমভাবাপন্নতা জনস্বাস্থ্যে মারাত্মক প্রভাব ফেলছে।
সংক্রামক ব্যাধি : বন্যা ও জলাবদ্ধতার কারণে মশাবাহিত রোগ (ডেঙ্গু, ম্যালেরিয়া) এবং পানিবাহিত রোগ (ডায়রিয়া, কলেরা) দ্রুত ছড়াচ্ছে।
তাপদাহ : গ্রীষ্মকালে অসহনীয় তাপদাহে হিটস্ট্রোকের ঝুঁকি বাড়ছে।

ঙ. জলবায়ু উদ্বাস্তু ও সামাজিক প্রভাব : জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে বাস্তুচ্যুত মানুষ জলবায়ু উদ্বাস্তু বা Climate Migrant হিসেবে দেশের অভ্যন্তরে (বিশেষত ঢাকা ও চট্টগ্রামের মতো বড় শহরে) আশ্রয় নিচ্ছে।
অভ্যন্তরীণ অভিবাসন: বিপুল সংখ্যক মানুষের শহরমুখী হওয়ার ফলে শহরের অবকাঠামো, অর্থনীতি ও পরিবেশের ওপর চাপ বাড়ছে।
সংঘাত ও অপরাধ : ঘনবসতিপূর্ণ শহরে সম্পদের জন্য প্রতিযোগিতা এবং জীবনযাত্রার মান হ্রাস পাওয়ায় সামাজিক সংঘাত ও অপরাধ বৃদ্ধি পাচ্ছে।

৩. জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলায় বাংলাদেশের উদ্যোগ : জলবায়ু পরিবর্তনের শিকার দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশই প্রথম, যারা নিজস্ব অর্থায়নে এই সংকট মোকাবিলায় সুদূরপ্রসারী কৌশল গ্রহণ করেছে।

ক. নীতি ও কৌশল প্রণয়ন : বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন কৌশল ও কর্মপরিকল্পনা (BCCSAP): ২০০৯ সালে প্রণীত এই কর্মপরিকল্পনা জলবায়ু সহনশীলতা বৃদ্ধি, দুর্যোগ মোকাবিলা, খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ এবং গবেষণা ও জ্ঞান ব্যবস্থাপনার ওপর জোর দেয়।

জাতীয় অভিযোজন পরিকল্পনা (NAP) : ২০৫০ সাল পর্যন্ত জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবিলায় দেশের দীর্ঘমেয়াদী চাহিদা চিহ্নিত করে অভিযোজনমূলক পদক্ষেপ গ্রহণের রোডম্যাপ তৈরি করা হয়েছে।

খ. নিজস্ব অর্থায়ন ও তহবিল : বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তন ট্রাস্ট ফান্ড (BCCTF): নিজস্ব সরকারি বাজেট থেকে অর্থ বরাদ্দ দিয়ে এই ট্রাস্ট ফান্ড গঠন করা হয়েছে। এই তহবিল থেকে উপকূলীয় বাঁধ নির্মাণ, সাইক্লোন শেল্টার তৈরি, এবং জলবায়ু সহনশীল কৃষি প্রযুক্তির প্রচলনে অর্থায়ন করা হয়।

গ. অভিযোজনমূলক পদক্ষেপ (Adaptation)
অভিযোজন হলো পরিবর্তিত জলবায়ু পরিস্থিতির সাথে খাপ খাইয়ে নেওয়া। বাংলাদেশ এই ক্ষেত্রে বহু উদ্ভাবনী উদ্যোগ নিয়েছে:
দুর্যোগ প্রস্তুতি : আগাম সতর্কতা ব্যবস্থা, আধুনিক সাইক্লোন শেল্টার নির্মাণ, এবং দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা প্রশিক্ষণ জোরদার করা হয়েছে।
জলবায়ু সহনশীল অবকাঠামো : সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধির সঙ্গে মানানসই ভাসমান স্কুল, সোলার প্যানেলের ব্যবহার, এবং উঁচু ভিত্তিযুক্ত বাড়ি নির্মাণে উৎসাহ দেওয়া হচ্ছে।
জলবায়ু সহনশীল কৃষি : লবণ সহনশীল ধান (যেমন: ব্রি ধান-৪৭, ব্রি ধান-৬৭) এবং বন্যা সহনশীল ফসল উদ্ভাবন ও প্রচলন করা হয়েছে।

ঘ. প্রশমনমূলক পদক্ষেপ (Mitigation)
প্রবাহমান জলবায়ু পরিবর্তনকে ধীর করার জন্য গ্রিনহাউস গ্যাসের নির্গমন হ্রাস করা প্রয়োজন।

নবায়নযোগ্য শক্তি: সরকার সৌরশক্তি, বায়ুশক্তি ও জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের ওপর জোর দিচ্ছে। গ্রামীণ এলাকায় সোলার হোম সিস্টেমের প্রচলন বিশ্বজুড়ে প্রশংসিত হয়েছে।
কয়লা নির্ভরতা হ্রাস: পরিবেশবান্ধব প্রযুক্তির দিকে ঝুঁকে কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ উৎপাদন পর্যায়ক্রমে হ্রাসের নীতি গ্রহণ করা হয়েছে।

৪. আন্তর্জাতিক সহযোগিতা এবং করণীয় : জলবায়ু পরিবর্তন একটি বৈশ্বিক সমস্যা। বাংলাদেশের এই বিপুল চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় আন্তর্জাতিক সহযোগিতা অপরিহার্য।

ক. জলবায়ু অর্থায়ন : উন্নত দেশগুলো কর্তৃক প্রতিশ্রুত জলবায়ু অর্থায়ন (বিশেষত গ্রিন ক্লাইমেট ফান্ড থেকে) বাংলাদেশের মতো ঝুঁকিপূর্ণ দেশগুলোর জন্য দ্রুত ও সহজলভ্য করা প্রয়োজন। বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক ফোরামে এই বিষয়ে নিয়মিত দাবি জানিয়ে আসছে।
খ. প্রযুক্তির হস্তান্তর : জলবায়ু সহনশীল নির্মাণ কৌশল, উন্নত বন্যা নিয়ন্ত্রণ প্রযুক্তি এবং পরিবেশবান্ধব শিল্পায়নের জন্য উন্নত বিশ্বের কাছ থেকে প্রযুক্তি ও জ্ঞান হস্তান্তরের প্রয়োজন।

গ. গবেষণা ও সক্ষমতা বৃদ্ধি : জলবায়ু পরিবর্তনের মডেলিং, প্রভাব মূল্যায়ন এবং কার্যকর স্থানীয় অভিযোজন কৌশল উদ্ভাবনের জন্য গবেষণা কার্যক্রম এবং স্থানীয় প্রতিষ্ঠানগুলোর সক্ষমতা বৃদ্ধিতে আন্তর্জাতিক সহায়তা প্রয়োজন।

ঘ. জনসচেতনতা ও সুশাসন : সফলভাবে এই সংকট মোকাবিলা করার জন্য সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে সুশাসন নিশ্চিত করা আবশ্যক। পাশাপাশি, সাধারণ মানুষের মধ্যে জলবায়ু পরিবর্তন সম্পর্কে সচেতনতা তৈরি করা এবং স্থানীয় পর্যায়ে তাদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা অত্যন্ত জরুরি। প্রকৃতিবান্ধব জীবনযাপন, বনায়ন বৃদ্ধি এবং পরিমিত ভোগবাদী সংস্কৃতি গড়ে তোলাই হতে পারে এই সমস্যা সমাধানের দীর্ঘমেয়াদী পথ।

৫. উপসংহার: ঘুরে দাঁড়ানোর প্রত্যয় জলবায়ু পরিবর্তন বাংলাদেশের অস্তিত্বের জন্য এক অনিবার্য হুমকি। সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি, চরম আবহাওয়া এবং অভ্যন্তরীণ অভিবাসনের সম্মিলিত চাপ দেশের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও পরিবেশগত স্থিতিশীলতাকে চ্যালেঞ্জ জানাচ্ছে। তবে, বাংলাদেশ এই চ্যালেঞ্জের মুখে শুধু অসহায় শিকার হয়ে থাকেনি। বরং, নিজস্ব সম্পদ এবং উদ্ভাবনী কৌশল প্রয়োগ করে এই সংকট মোকাবিলায় বিশ্বকে পথ দেখাচ্ছে। সরকারের গৃহীত সুদূরপ্রসারী নীতিমালা, BCCTF-এর মতো নিজস্ব তহবিল গঠন এবং জলবায়ু সহনশীল কৃষির মতো অভিযোজনমূলক পদক্ষেপগুলো প্রমাণ করে যে বাংলাদেশ কেবল প্রতিক্রিয়াই দেখাচ্ছে না, বরং সক্রিয়ভাবে এর মোকাবিলাও করছে।
জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলা একটি চলমান প্রক্রিয়া, যা শুধু প্রকৌশলগত সমাধান বা সরকারি উদ্যোগের মাধ্যমে সফল হবে না। আন্তর্জাতিক ন্যায়বিচার নিশ্চিত করা, বিশ্বজুড়ে জীবাশ্ম জ্বালানির ব্যবহার হ্রাস করা এবং প্রতিটি নাগরিকের পরিবেশবান্ধব জীবনবোধ—এই সম্মিলিত প্রয়াসই পারে বাংলাদেশের মতো ঝুঁকিপূর্ণ দেশকে এই কালের সঙ্কট থেকে রক্ষা করতে এবং এক জলবায়ু সহনশীল ভবিষ্যৎ নিশ্চিত করতে। এই যুদ্ধে বিজয়ী হতে প্রয়োজন দৃঢ় রাজনৈতিক সদিচ্ছা এবং জনগণের সম্মিলিত ঘুরে দাঁড়ানোর প্রত্যয়।

ঘ. বার্ধক্য ও বৃদ্ধাশ্রম

ভূমিকা : বার্ধক্য মানবজীবনের এক অনিবার্য সত্য, এক স্বাভাবিক পরিণতি। শৈশব, কৈশোর ও যৌবনের পর বার্ধক্য আসে জীবনের অভিজ্ঞতাসমৃদ্ধ এক শান্ত সময় নিয়ে। এই সময়ে মানুষ তার কর্মজীবনের ইতি টেনে বিশ্রাম ও পারিবারিক সান্নিধ্য কামনা করে। কিন্তু দ্রুত পরিবর্তনশীল সমাজ, ভাঙনমুখী পারিবারিক সম্পর্ক এবং অর্থনৈতিক জটিলতা বার্ধক্যকে করেছে এক কঠিন চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন। একসময় যেখানে পরিবারই ছিল বয়স্কদের নিরাপদ আশ্রয়, আজ সেখানে 'বৃদ্ধাশ্রম' নামক প্রতিষ্ঠানগুলিই হয়ে উঠেছে বহু প্রবীণ মানুষের শেষ ঠিকানা। এই প্রবন্ধে বার্ধক্য কী, কেন বৃদ্ধাশ্রমের জন্ম হলো, এর সামাজিক ও মনস্তাত্ত্বিক প্রভাব এবং এই মানবিক সমস্যার সমাধানে আমাদের করণীয় কী—তা বিশদভাবে আলোচনা করা হলো।

১. বার্ধক্য : জীবনের এক স্বাভাবিক স্তর বার্ধক্য হলো মানুষের জীবনের সেই পর্যায়, যখন শারীরিক ও মানসিক কর্মক্ষমতা ধীরে ধীরে হ্রাস পেতে থাকে। সাধারণত ৬০ বছর বা তার বেশি বয়সীদের প্রবীণ বা বয়স্ক নাগরিক হিসেবে গণ্য করা হয়।

ক. বার্ধক্যের স্বরূপ : বার্ধক্য কেবল শারীরিক দুর্বলতা নয়, এটি জীবনের একটি বিশেষ সময়। এই সময় প্রবীণরা একদিকে যেমন দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতা ও প্রজ্ঞা নিয়ে সমাজের দিকনির্দেশক হিসেবে ভূমিকা রাখতে পারেন, তেমনি অন্যদিকে তাঁরা শারীরিক অসুস্থতা, একাকীত্ব ও অসহায়তার সম্মুখীন হন।

শারীরিক পরিবর্তন : এই সময় স্মৃতিশক্তি হ্রাস, দৃষ্টি ও শ্রবণশক্তির দুর্বলতা, বিভিন্ন দীর্ঘস্থায়ী রোগ (যেমন ডায়াবেটিস, উচ্চ রক্তচাপ, বাতের ব্যথা) এবং চলাফেরায় সীমাবদ্ধতা দেখা দেয়।
মানসিক পরিবর্তন : কর্মজীবনের সমাপ্তি, প্রিয়জনদের বিয়োগ এবং সমাজের কাছে গুরুত্ব হারানোর অনুভূতি অনেক সময় প্রবীণদের মধ্যে হতাশা, বিষণ্নতা ও একাকীত্বের জন্ম দেয়।

খ. পরিবারে প্রবীণদের গুরুত্ব : ঐতিহ্যগতভাবে, বাঙালি পরিবারগুলোতে প্রবীণরা ছিলেন 'পরিবারের বটবৃক্ষ'। তাঁরা ছিলেন জ্ঞাতা, উপদেষ্টা এবং পারিবারিক মূল্যবোধ ও রীতিনীতির ধারক। তাঁদের অভিজ্ঞতা ও পরামর্শ পরিবারের সিদ্ধান্ত গ্রহণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখত। নাতি-নাতনিদের সঙ্গে তাঁদের সম্পর্ক ছিল স্নেহ ও প্রজ্ঞার সেতুবন্ধন। এই সময়ে তাঁরা মানসিক সমর্থন ও সেবা পেতেন।

২. বৃদ্ধাশ্রমের উত্থান: কারণ ও প্রেক্ষাপট : বৃদ্ধাশ্রম হলো এমন একটি প্রতিষ্ঠান, যেখানে পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন প্রবীণ বা অসহায় বয়স্কদের থাকা, খাওয়া ও চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়। একসময় এই ধারণাটি বাঙালি সমাজে অপরিচিত থাকলেও, বর্তমানে এর সংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে।

ক. আর্থ-সামাজিক কারণ :
বৃদ্ধাশ্রমের উত্থানের পেছনে রয়েছে একাধিক গভীর আর্থ-সামাজিক কারণ:
অ-যৌথ পরিবার (Nuclear Family) : যৌথ পরিবার ভেঙে একক পরিবারের দিকে ঝুঁকে পড়ায় প্রবীণদের সাথে পরবর্তী প্রজন্মের মানসিক ও শারীরিক দূরত্ব বেড়েছে।
নারীর কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ : একসময় বাড়ির প্রবীণদের সেবার মূল দায়িত্ব ছিল মহিলাদের ওপর। কর্মক্ষেত্রে মহিলাদের ব্যস্ততা বাড়ায় প্রবীণদের সার্বক্ষণিক দেখাশোনা করা কঠিন হয়ে পড়েছে।

শহরায়ন ও জীবিকার তাগিদ : জীবিকার সন্ধানে সন্তানদের গ্রাম ছেড়ে শহরে পাড়ি দেওয়া বা বিদেশে চলে যাওয়ার ফলে প্রবীণরা বাড়িতে একা হয়ে যাচ্ছেন।
অর্থনৈতিক অস্থিরতা : দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি এবং সীমিত আয়ের কারণে সন্তানেরা অনেক সময় প্রবীণ বাবা-মায়ের চিকিৎসা বা অন্যান্য ব্যয়ভার বহন করতে অক্ষম হচ্ছেন।
সম্পদের মালিকানা বিতর্ক : অনেক ক্ষেত্রে সম্পত্তির অধিকার নিয়ে পারিবারিক বিবাদ এবং সংঘাতের জেরেও প্রবীণরা পরিবারে অবহেলিত বা অবাঞ্ছিত হয়ে পড়ছেন।

খ. মানসিক ও সাংস্কৃতিক কারণ : মূল্যবোধের পরিবর্তন: ভোগবাদী ও ব্যক্তিকেন্দ্রিক পশ্চিমা সংস্কৃতির প্রভাবে পারিবারিক দায়িত্ববোধ ও প্রবীণদের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ হ্রাস পাচ্ছে।
সময় ও ধৈর্য্যের অভাব : দ্রুতগতির জীবনে নতুন প্রজন্ম তাদের বাবা-মা বা শ্বশুর-শাশুড়ির জন্য পর্যাপ্ত সময় দিতে পারছে না, যা প্রবীণদের মনস্তাত্ত্বিক চাহিদা পূরণ করতে ব্যর্থ হচ্ছে।
প্রজন্মের ব্যবধান (Generation Gap) : প্রযুক্তির অগ্রগতি এবং জীবনযাত্রার ভিন্নতার কারণে দুই প্রজন্মের মধ্যে চিন্তাভাবনা ও জীবনবোধের বিশাল পার্থক্য তৈরি হচ্ছে, যা সংঘাত বাড়াচ্ছে।

৩. বৃদ্ধাশ্রমের মনস্তাত্ত্বিক ও সামাজিক প্রভাব: বৃদ্ধাশ্রম প্রবীণদের শেষ আশ্রয়স্থল হলেও এর সাথে যুক্ত আছে বহু মানসিক যন্ত্রণা ও সামাজিক প্রশ্ন।
ক. মনস্তাত্ত্বিক আঘাত : পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে বৃদ্ধাশ্রমে আশ্রয় নেওয়া প্রবীণদের জন্য এক গভীর মনস্তাত্ত্বিক আঘাত।
একাকীত্ব ও হতাশা : পরিবার, বিশেষত নাতি-নাতনিদের সান্নিধ্য থেকে বঞ্চিত হয়ে তাঁরা তীব্র একাকীত্বে ভোগেন। নিজের জন্ম দেওয়া পরিবার দ্বারা পরিত্যক্ত হওয়ার অনুভূতি তাঁদের মধ্যে গভীর হতাশা ও বিষণ্নতা সৃষ্টি করে।
গৌরব হারানোর যন্ত্রণা : দীর্ঘ কর্মজীবনের পর হঠাৎ করে কোনো প্রাতিষ্ঠানিক পরিবেশে বন্দি হওয়া এবং সামাজিক গুরুত্ব হারানো তাঁদের আত্মমর্যাদাকে ক্ষুণ্ন করে।
স্মৃতিচারণ : যদিও বৃদ্ধাশ্রমে সমবয়সীদের সাহচর্য মেলে, তবুও নিজের বাড়ির স্মৃতি ও ফেলে আসা প্রিয়জনদের কথা তাঁদের প্রতিনিয়ত যন্ত্রণা দেয়।

খ. সামাজিক প্রশ্ন ও প্রভাব : বৃদ্ধাশ্রমের বিস্তার সমাজের কাঠামো এবং নৈতিক ভিত্তি নিয়ে প্রশ্ন তোলে।
পারিবারিক বন্ধনের শিথিলতা: বৃদ্ধাশ্রম যত সহজলভ্য হচ্ছে, পারিবারিক বন্ধন ততই দুর্বল হচ্ছে। এটি প্রবীণদের প্রতি দায়িত্ব এড়িয়ে যাওয়ার একটি 'সহজ উপায়' হিসেবে কাজ করতে পারে।
সাংস্কৃতিক অবক্ষয় : প্রবীণদের প্রতি যত্ন না নেওয়া আমাদের ঐতিহ্যবাহী পারিবারিক মূল্যবোধের অবক্ষয় নির্দেশ করে।
আইনি ও নৈতিক দ্বন্দ্ব : যদিও বৃদ্ধাশ্রম কখনো কখনো প্রয়োজন হয়, তবুও অনেক ক্ষেত্রে এটি সন্তানদের নৈতিক অবহেলার প্রতীক হিসেবে বিবেচিত হয়।

৪. সমাধানের পথ ও করণীয় : বৃদ্ধাশ্রমের সংখ্যাবৃদ্ধি কোনো সুস্থ সমাজের লক্ষণ নয়। এই সমস্যা সমাধানে ব্যক্তিগত, পারিবারিক, প্রাতিষ্ঠানিক ও রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে সমন্বিত উদ্যোগ গ্রহণ করা অপরিহার্য।

ক. পারিবারিক ও ব্যক্তিগত উদ্যোগ :
সময়ের বিনিয়োগ : নতুন প্রজন্মকে বুঝতে হবে যে প্রবীণদের সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন অর্থ নয়, বরং তাঁদের জন্য সময় ও মনোযোগ।
সম্মান ও সহমর্মিতা : প্রবীণদের অভিজ্ঞতা ও জ্ঞানকে সম্মান জানাতে হবে। তাঁদের শারীরিক ও মানসিক সীমাবদ্ধতা মেনে নিয়ে সহমর্মী আচরণ করতে হবে।
প্রজন্মের সেতুবন্ধন : নাতি-নাতনিদের সঙ্গে দাদা-দাদি/নানা-নানিদের সম্পর্ক জোরদার করতে হবে, যা প্রবীণদের একাকীত্ব দূর করতে সবচেয়ে কার্যকর।

খ. সামাজিক ও প্রাতিষ্ঠানিক পদক্ষেপ
ডে-কেয়ার ও স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্র : কর্মজীবী সন্তানদের সুবিধার জন্য প্রবীণদের জন্য ডে-কেয়ার সেন্টার চালু করা যেতে পারে, যেখানে দিনের বেলায় তাঁদের দেখাশোনা ও বিনোদনের ব্যবস্থা থাকবে।
সামাজিক সচেতনতা : গণমাধ্যম ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোতে প্রবীণদের প্রতি দায়িত্ববোধ ও শ্রদ্ধার সংস্কৃতি গড়ে তোলার জন্য ব্যাপক প্রচার চালাতে হবে।
এনজিও ও কমিউনিটি উদ্যোগ : স্থানীয় এনজিও এবং কমিউনিটি সংগঠনগুলোর মাধ্যমে প্রবীণদের বিনোদন, স্বাস্থ্য পরীক্ষা এবং সামাজিক অংশগ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি করতে হবে।

গ. রাষ্ট্রীয় ও আইনি সহায়তা
আইনের বাস্তবায়ন : পিতামাতা ও প্রবীণ নাগরিকদের ভরণপোষণ সংক্রান্ত আইন কঠোরভাবে প্রয়োগ করতে হবে, যাতে সন্তানেরা তাঁদের দায়িত্ব পালনে বাধ্য হয়।
সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি : বয়স্ক ভাতা, বিনামূল্যে চিকিৎসা সুবিধা এবং পরিবহণে বিশেষ ছাড়ের মতো সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচিগুলো আরও সম্প্রসারিত ও কার্যকর করতে হবে।
স্বাস্থ্যসেবা সুবিধা : দেশের প্রতিটি স্বাস্থ্যকেন্দ্রে প্রবীণদের জন্য বিশেষায়িত 'জেরিয়াট্রিক' স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করতে হবে।

৫. উপসংহার: মানবিক সমাজের প্রত্যাশা : বার্ধক্য মানবজীবনের এক স্বাভাবিক প্রক্রিয়া এবং প্রবীণরা সমাজের এক অভিজ্ঞতার ভান্ডার। এই বয়সে তাঁদের সর্বোচ্চ মর্যাদা, নিরাপত্তা ও পারিবারিক ভালোবাসা পাওয়ার অধিকার রয়েছে। বৃদ্ধাশ্রম হয়তো একটি বাস্তবতার প্রতীক, কিন্তু এটি কখনোই আদর্শ সমাধান হতে পারে না।
বৃদ্ধাশ্রমের প্রয়োজন যেন একটি ব্যর্থ সমাজের পরিচায়ক না হয়, সেই লক্ষ্যে আমাদের প্রতিটি পরিবারকে একযোগে কাজ করতে হবে। পারিবারিক মূল্যবোধকে পুনরুদ্ধার করা, নতুন প্রজন্মের মধ্যে সহনশীলতা ও দায়িত্ববোধের জন্ম দেওয়া এবং রাষ্ট্রীয়ভাবে প্রবীণদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার মাধ্যমেই আমরা বার্ধক্যকে অভিশাপের পরিবর্তে আশীর্বাদে পরিণত করতে পারি। একটি মানবিক ও সুস্থ সমাজ গঠনে প্রবীণদের প্রতি আমাদের সম্মিলিত দায়িত্ব পালনের কোনো বিকল্প নেই। এইভাবেই আমরা কেবল বৃদ্ধাশ্রমের দিকে ঝুঁকে পড়া প্রবণতাকে রোধ করতে পারি এবং প্রবীণদের জন্য একটি সুন্দর, নিরাপদ ও মর্যাদাপূর্ণ শেষ জীবন নিশ্চিত করতে পারি।

গণিত : ২ (৩০)

[খাতায় উত্তর লেখার সময় প্রার্থীদের অবশ্যই প্রশ্নের ক্রমানুসারে উত্তর লিখতে হবে; অন্যথায় উত্তর মূল্যায়নযোগ্য হবে না।]

(যে কোন ৬টি প্রশ্নের উত্তর দিন।)

** নির্দেশনা :

i. গণিতে ভুল হলে যে জায়গায় ভুল হয়েছে, সেটি দেখিয়ে দিবেন ও কয়েক লাইন লিখে দিবেন।
ii. সঠিক উত্তরটি লিখে দিবেন প্লিজ।
iii. চিত্র সঠিকভাবে (স্কেল ও কম্পাস ব্যবহার করে) এঁকেছে কি-না তা দেখবেন প্লিজ।

১. ক একটি কাজ ১২ দিনে এবং খ ২৪ দিনে করতে পারে। তারা একত্রে কাজটি শুরু করে এবং কয়েক দিন পর ক কাজটি অসমাপ্ত রেখে চলে যায়। বাকি কাজ খ ৩ দিনে শেষ করে। মোট কতদিনে কাজটি সম্পূর্ণ হয়? **৫**

ব্যাখ্যা : ক কাজটি করে ১২ দিনে ১ অংশ

ক ১ দিনে করে কাজটির $\frac{১}{১২}$ অংশ

খ কাজটি সম্পূর্ণ করে ২৪ দিনে ১ অংশ

খ ১ দিনে করে কাজটির $\frac{১}{২৪}$ অংশ

খ ৩ দিনে করে কাজটির $\frac{১ \times ৩}{২৪} = \frac{১}{৮}$ অংশ

সুতরাং অবশিষ্ট কাজটুকু হলো $\left(১ - \frac{১}{৮}\right) = \frac{৭}{৮}$ অংশ যা (ক + খ) একত্রে করেছিল।

(ক + খ) ১ দিনে করে কাজটির $\left(\frac{১}{১২} - \frac{১}{২৪}\right) = \frac{২ + ১}{২৪} = \frac{৩}{২৪} = \frac{১}{৮}$ অংশ

(ক + খ) $\frac{১}{৮}$ অংশ কাজ করে ১ দিনে

(ক + খ) ১ অংশ কাজ করে ১ × ৮ দিনে

(ক + খ) $\frac{৭}{৮}$ অংশ কাজ করে $\frac{৮ \times ৭}{৮}$ দিনে = ৭ দিনে

∴ কাজটি শেষ হয় (৭ + ৩) = ১০ দিনে

২. ΔABC এর D ও E যথাক্রমে AB ও AC এর মধ্যবিন্দু এবং ∠B ও ∠C এর সমদ্বিখণ্ডকদ্বয় O বিন্দুতে মিলিত হয়েছে।

(ক) প্রমাণ করুন যে, DE || BC এবং DE = $\frac{1}{2}$ BC **২.৫**

Sol^{n}:

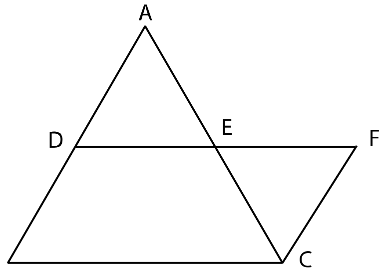

বিশেষ নির্বচন : মনে করি, ABC একটি ত্রিভুজ যার AB ও AC বাহুর মধ্যবিন্দু যথাক্রমে D ও E ।

প্রমাণ করতে হবে যে, DE = $\frac{1}{2}$ BC এবং DE || BC

অঙ্কন : DE কে F পর্যন্ত বর্ধিত করি। যেন DE = EF হয়। C, F যোগ করি।

প্রমাণ : Δ ADE ও ΔCEF এ

AE = CE [E, AC এর মধ্যবিন্দু বলে]

DE = EF [অঙ্কনানুসারে]

∠AED = ∠CEF [বিপ্রতীপ কোণ]

Δ ADE ≅ ΔCEF

∴ AD = CF

অর্থাৎ BD = CF [∵ D, AB এর মধ্যবিন্দু]

এখন, ∠DAE = ∠ECF [একান্তর কোণ]

অর্থাৎ ∠DAC = ∠ACF

∴ AD | | CF [∵∠DAC ও ∠ECF একান্তর কোণ]

অর্থাৎ BD | | CF

অতএব BCDF একটি সামান্তরিক।

সুতরাং DF | | BC

অর্থাৎ DE | | BC

এবং DF = BC

বা, DE + EF = BC

বা, DE + DE = BC

বা, 2DE = BC

∴ DE = $\frac{1}{2}$ BC (Proved)

(খ) প্রমাণ করুন যে, $\angle BOC = 90^0 + \frac{1}{2}\angle A$ ২.৫

Sol^n: সাধারণ নির্বচন: ΔABC এর $\angle B$ ও $\angle C$ এর সমদ্বিখন্ডকদ্বয় O বিন্দুতে মিলিত হয়। প্রমাণ করতে হবে যে, $\angle BOC = 90^0 + \frac{1}{2}\angle A$

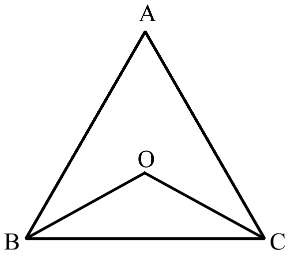

বিশেষ নির্বচন : মনে করি, ABC ত্রিভুজের $\angle B$ ও $\angle C$ এর সমদ্বিখন্ডকদ্বয় O বিন্দুতে মিলিত হয়েছে।

প্রমাণ করতে হবে যে, $\angle BOC = 90^0 + \frac{1}{2}\angle A$

প্রমাণ : ΔBOC-এ $\angle BOC + \angle OBC + \angle OCB = 180^o$

বা, $\angle BOC + \frac{1}{2}\angle B + \frac{1}{2}\angle C = 180^0$

বা, $\angle BOC + \frac{1}{2}(\angle B + \angle C) = 180^0$

বা, $\frac{1}{2}(\angle B + \angle C) = 180^0 - \angle BOC$ .... (i)

$\therefore$ ΔABC-এ $\angle A + \angle B + \angle C = 180^0$

$\therefore \frac{1}{2}(\angle A + \angle B + \angle C) = \frac{1}{2} \times 180^0$

বা, $\frac{1}{2}\angle A + \frac{1}{2}\angle B + \frac{1}{2}\angle C = 90^0$ বা, $\frac{1}{2}(\angle B + \angle C) = 90^0 - \frac{1}{2}\angle A$

বা, $180^o - \angle BOC = 90^o - \frac{1}{2}\angle A$ [i নং সাহায্যে]

বা, $\angle BOC + 90^0 - \frac{1}{2}\angle A = 180^0$ $\therefore \angle BOC = 90^0 + \frac{1}{2}\angle A$ (প্রমাণিত)

৩. (ক) **$\cos A + \sin A = \sqrt{2}\cos A$ হলে, প্রমাণ করুন যে, $\cos A - \text{Sin } A = \sqrt{2}\sin A$** ২.৫

Sol^n: দেওয়া আছে, $\cos A + \sin A = \sqrt{2}\cos A$

বা, $\sin A = \sqrt{2}\cos A - \cos A$

বা, $\sin A = \cos A(\sqrt{2} - 1)$

বা, $\sin A = \frac{\cos A(\sqrt{2} - 1)(\sqrt{2} + 1)}{(\sqrt{2} + 1)}$

বা, $\sin A = \frac{\cos A\{(\sqrt{2})^2 - (1)^2\}}{(\sqrt{2} + 1)}$

বা, $\sin A = \frac{\cos A(2 - 1)}{(\sqrt{2} + 1)}$

বা, $\sin A = \frac{\cos A}{(\sqrt{2} + 1)}$

বা, $\sin A(\sqrt{2} + 1) = \cos A$

বা, $\sqrt{2}\sin A + \sin A = \cos A$

বা, $\sqrt{2}\sin A = \cos A - \sin A$

বা, $\cos A - \sin A = \sqrt{2}\sin A$ $\therefore \cos A - \sin A = \sqrt{2}\sin A$ (প্রমাণিত)

(খ) **একটি খুঁটি এমন ভাবে ভেঙে গেল যে, তার অবিচ্ছিন্ন ভাঙা অংশ দণ্ডায়মান অংশের সাথে 30^0 কোণ উৎপন্ন করে খুঁটির গোড়া থেকে 10 মিটার দূরে মাটি স্পর্শ করে। খুঁটির সম্পূর্ণ দৈর্ঘ্য নির্ণয় করুন।** ২.৫

মনে করি, খুঁটির সম্পূর্ণ দৈর্ঘ্য $AB = h$ মিটার, খুঁটিটি $BC = x$ মিটার উচ্চতায় ভেঙে গিয়ে বিচ্ছিন্ন না হয়ে ভাঙা অংশ দণ্ডায়মান অংশের সাথে $\angle BCD = 30^0$ উৎপন্ন করে খুঁটির গোড়া থেকে $BD = 10$ মিটার দূরে মাটি স্পর্শ করে।

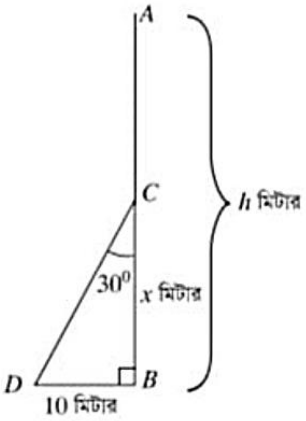

এখানে, $CD = AC = AB - BC = (h - x)$ মিটার

$\triangle BCD$ থেকে পাই,

$\tan\angle BCD = \frac{BD}{BC}$ বা, $\tan 30^\circ = \frac{10}{x}$

বা, $\frac{1}{\sqrt{3}} = \frac{10}{x}$ $\therefore x = 10\sqrt{3}$

আবার, $\sin\angle BCD = \frac{BD}{CD}$ বা, $\sin 30^0 = \frac{BD}{CD}$ বা, $\frac{1}{2} = \frac{10}{h - x}$

বা, $h - x = 20$ বা, $h = 20 + x$ বা, $h = 20 + 10\sqrt{3}$ [x এর মান বসিয়ে]

$\therefore h = 37.321$ (প্রায়)

$\therefore$ খুঁটির দৈর্ঘ্য 37.32 মিটার (প্রায়)।

৪. (ক) পিতা ও পুত্রের বর্তমান বয়সের অনুপাত 7 : 2 এবং 5 বছর পরে তাদের বয়সের অনুপাত 8 : 3 হবে। তাদের বর্তমান বয়স কত? ২.৫

সমাধান : মনে করি, পিতার বর্তমান বয়স a বছর এবং পুত্রের বর্তমান বয়স b বছর।

প্রশ্নের প্রথম ও দ্বিতীয় শর্তানুসারে যথাক্রম পাই,

$$\frac{a}{b}=\frac{7}{2}\ldots(1)$$

$$\frac{a+5}{b+5}=\frac{8}{3}\ldots(2)$$

সমীকরণ (1) থেকে পাই,

$$a=\frac{7b}{2}\ldots(3)$$

সমীকরণ (2) থেকে পাই,

$$3(a+5)=8(b+5)$$

বা, $3a+15=8b+40$

বা, $3a-8b=40-15$

বা, $3\times\frac{7b}{2}-8b=25$ [(3) ব্যবহার করে]

বা, $\frac{21b-16b}{2}=25$

বা, $5b=50$

$\therefore b=10$

সমীকরণ (3) এ $b=10$ বসিয়ে পাই, $a=\frac{7\times10}{2}=35$

$\therefore$ পিতার বর্তমান বয়স 35 বছর এবং পুত্রের বর্তমান বয়স 10 বছর।

(খ) একটি আয়তকার কক্ষের ক্ষেত্রফল ১৯২ বর্গমিটার। এর দৈর্ঘ্য ৪ মিটার কমালে এবং প্রস্থ ৪ মিটার বাড়ালে ক্ষেত্রফল অপরিবর্তিত থাকে। আয়তকার কক্ষের সমান পরিসীমাবিশিষ্ট বর্গাকার কক্ষের ক্ষেত্রফল কত হবে? ২.৫

ব্যাখ্যা : ধরি দৈর্ঘ্য x মি. প্রস্থ y মি.

ক্ষেত্রফল $xy=192$ ... ... (i)

এবং $(x-4)(y+4)=192$ ... ... (ii)

$\Rightarrow xy+4x-4y-16=192 \Rightarrow 192+4(x-y)-16=192$ [xy=192]

$\Rightarrow 4(x-y)=16 \Rightarrow x-y=4 \therefore x=4+y$ ... ... (iii)

(i) $\Rightarrow y(y+4)=192 \Rightarrow y^2+4y-192=0$

$\Rightarrow y^2+16y-12y-192=0 \Rightarrow y(y+16)-12(y+16)=0$

$\Rightarrow (y-12)(y+16)=0 \therefore y=12$ & $y=-16\neq(+ve)$

(iii) $\therefore x=4+12=16$

পরিসীমা $=2(12+16)=56$

বর্গক্ষেত্রের বাহুর দৈর্ঘ্য $=\frac{56}{4}=14$

বর্গক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল $=(14)^2=196$ বর্গ মি.

৫. **(ক) একজন দোকানদার ৭$\frac{১}{২}$ % ক্ষতিতে একটি দ্রব্য বিক্রয় করল। যদি দ্রব্যটির ক্রয়মূল্য ১০% কম হত এবং বিক্রয়মূল্য ৩১ টাকা বেশি হত, তাহলে ২০% লাভ হত। দ্রব্যটির ক্রয়মূল্য কত?** ২.৫

ব্যাখ্যা :

৭$\frac{১}{২}$% ক্ষতিতে বিক্রয় মূল্য $\left(১০০-৭\frac{১}{২}\right)$ টাকা $=\frac{১৮৫}{২}$ টাকা

১০% কমে ক্রয় মূল্য (১০০−১০) টাকা = ৯০ টাকা

এবং ২০% লাভে বিক্রয় মূল্য $\left(৯০+\frac{৯০\times২০}{১০০}\right)$ টাকা = ১০৮ টাকা

দুই বিক্রয়মূল্যের পার্থক্য $\left(১০৮-\frac{১৮৫}{২}\right)$ টাকা $=\frac{৩১}{২}$ টাকা

বিক্রয়মূল্য $\frac{৩১}{২}$ টাকা বেশি হলে ক্রয়মূল্য ১০০ টাকা

" ১ " " " " $\frac{১০০\times২}{৩১}$ টাকা

" ৩১ " " " " $\frac{১০০\times২\times৩১}{৩১}$ টাকা = ২০০ টাকা।

(খ) **বার্ষিক ১০% হারে কোনো মূলধনের ২ বছরের চক্রবৃদ্ধি মুনাফা ৫২৫ টাকা। বার্ষিক অর্ধেক হার সরল মুনাফায় একই মূলধন হতে দ্বিগুণ সময়ে কত মুনাফা পাওয়া যাবে?** ২.৫

ব্যাখ্যা :

চক্রবৃদ্ধি সুদের ক্ষেত্রে, মূলধন, $p = ?$, সময়, $t = 2$ বছর

বছরে চক্রবৃদ্ধির সংখ্যা, $n = 1$ বার্ষিক শতকরা সুদের হার, $r = 10\%$

সবৃদ্ধিমূল, $a = (p + 525)$ টাকা

চক্রবৃদ্ধি মুনাফায় সবৃদ্ধিমূল, $a = p\left(1 + \frac{r}{100n}\right)^{n \times t}$ টাকা

বা, $p + 525 = p\left(1 + \frac{10}{100\times1}\right)^{1 \times 2}$ বা, $p + 525 = p \times (1.1)^2$

বা, $p + 525 = 1.21p$ বা, $0.21p + = 525$ $\therefore p = \frac{525}{0.21} = 2500$

সরল সুদের ক্ষেত্রে, আসল, $p = 2500$ টাকা, সময় $t = (2 \times 2)$ বছর $= 4$ বছর

বার্ষিক শতকরা সুদের হার, $r\% = \frac{10}{2} = 5$

$\therefore$ নির্ণেয় সুদ $= \frac{prt}{100}$ টাকা $= \frac{2500 \times 5 \times 4}{100}$ টাকা $= 500$ টাকা

৬. **O কেন্দ্রবিশিষ্ট বৃত্তের AB ও CD জ্যা দুইটি বৃত্তের অভ্যন্তরে অবস্থিত কোনো বিন্দুতে সমকোণে মিলিত হয়েছে। প্রমাণ করুন যে, $\angle$AOD + BOC = দুই সমকোণ।** ৫

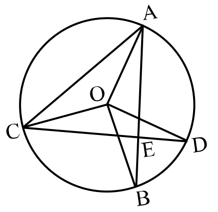

সমাধান :

সাধারণ নির্বচন : O কেন্দ্রবিশিষ্ট বৃত্তের AB ও CD জ্যা দুটি বৃত্তের অভ্যন্তরে অবস্থিত কোন বিন্দুতে সমকোণে মিলিত হয়েছে।

প্রমাণ করতে হবে যে,

$\angle AOD + \angle BOC$ = দুই সমকোণ।

বিশেষ নির্বচন: মনে করি, O কেন্দ্রবিশিষ্ট ACB বৃত্তের AB ও CD জ্যা দুইটি E বিন্দুতে সমকোণে মিলিত হয়েছে।

সুতরাং $\angle AEC$ = এক সমকোণ

অঙ্কন : A, C যোগ করি।

প্রমাণ : ΔAEC হতে পাই, $\angle ACE + \angle CAE + \angle AEC = 180^0$

বা, $\angle ACE + \angle CAE = 180^0 - 90^0$

$\therefore \angle ACE + \angle CAE = 90^0$.................... (i)

আমরা জানি, বৃত্তের একই চাপের উপর দণ্ডয়মান কেন্দ্রস্থ কোণ বৃত্তস্থ কোণের দ্বিগুণ,

$\therefore$ AD চাপের ক্ষেত্রে পাই,

$\angle AOD = 2\angle ACD$ .... (ii)

আবার BC চাপের ক্ষেত্রে পাই,

$\angle BOC = 2\angle BAC$ .... (iii)

(ii) + (iii) যোগ করে পাই,

$\angle AOD + \angle BOC = 2(\angle ACD + \angle BAC)$

$= 2(\angle ACE + \angle CAE)$

$= 2 \times 90^0$ [(i) নং ব্যবহার করে]

$\angle AOD + \angle BOC$ = দুই সমকোণ, **(প্রমাণিত)**

৭. **দেখান যে, A(0, –1), B(–2, 3), C(6, 7) এবং D(8, 3) বিন্দুগুলো একটি আয়তক্ষেত্র চারটি শীর্ষ। কর্ণদ্বয়ের দৈর্ঘ্য এবং আয়তক্ষেত্রটির ক্ষেত্রফল নির্ণয় করুন।** ৫

সমাধান : প্রদত্ত শীর্ষবিন্দু চারটি যোগ করে ABCD আয়তক্ষেত্র অংকন করা হল।

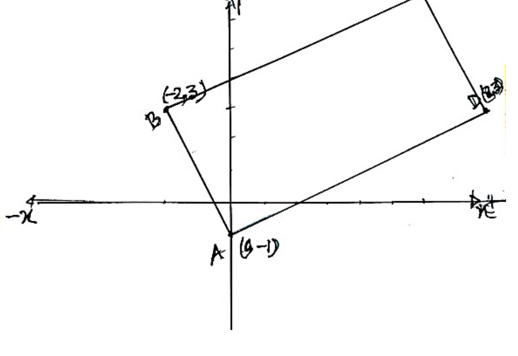

AB বাহুর দৈর্ঘ্য= $\sqrt{(-2-0)^2 + (3+1)^2} = \sqrt{20}$ একক

BC বাহুর দৈর্ঘ্য = $\sqrt{(6+2)^2 + (7-3)^2} = \sqrt{80}$ একক

CD বাহুর দৈর্ঘ্য $\sqrt{(8-6)^2 + (3-7)^2} = \sqrt{20}$ একক

DA বাহুর দৈর্ঘ্য $\sqrt{(0-8)^2 + (-1-3)^2} = \sqrt{80}$ একক

AC কর্ণের দৈর্ঘ্য = $\sqrt{(6-0)^2 + (7+1)^2} = 10$ একক

BD কর্ণের দৈর্ঘ্য = $\sqrt{(8+2)^2+(3-3)^2}$ = 10 একক।

$\because$ AB = CD এবং BC = DA

আবার কর্ণ AC = কর্ণ BD, তাই ABCD একটি আয়তক্ষেত্র।

কর্ণ AC এর দৈর্ঘ্য $= \sqrt{(7+1)^2+(6-0)^2}$

$= \sqrt{8^2+6^2}$

$= \sqrt{64+36}$

$= 10$ একক.

কর্ণ BD এর দৈর্ঘ্য $= \sqrt{(3-3)^2+(8+2)^2}$

$= \sqrt{10^2}$

$= 10$ একক.

ক্ষেত্রফল $= \frac{1}{2}\begin{vmatrix} 0 & -2 & 6 & 8 & 0 \\ -1 & 3 & 7 & 3 & -1 \end{vmatrix}$

$= \frac{1}{2}\left|\left[(0-14+18-8)-(0+56+18+2)\right]\right|$

$= \frac{1}{2}\left|-4-56-20\right|$

$= \frac{1}{2}\left|-80\right|$

$= 40$ বর্গ. একক.